ইন্টারনেট সংযোগকে কেন্দ্র করে সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছে একটি সুবিস্তৃত জগত। এর নাম ভার্চুয়াল জগত। ইন্টারনেট বন্ধনে পৃথিবী আজ পরিণত হয়েছে 'বিশ্বগ্রাম' তথা গে-বাল ভিলেজে। এই জগতকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই গড়ে উঠছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। শব্দের নানা অপভ্রংশ আর সঙ্কেত সংযোজনের মাধ্যমে প্রচলন ঘটেছে ই-ভাষার। ভার্চুয়াল জগতে পরিভ্রমণকারীরা সবচেয়ে আধুনিক প্রজন্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে 'নেটিজেন'। নেটিজেনদের এই জগতে 'নেই' বলে কিছু নেই। কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে, শিক্ষায়-বিনোদনে; নিত্য চাহিদা পূরণেই এই ভার্চুয়াল জগতে প্রতিদিনই আমরা 'টু' মারছি। ঘুরছি, ফিরছি নতুন এই জগতের সৌরভ কিংবা কাঁধা দুই-ই ব্যাপক প্রভাব রাখছে আমাদের জীবনে।

কিন্তু হালে এই ভার্চুয়াল জগতেও শুরু হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়। এখানকার নানা কূহকে বিভ্রান্ত হচ্ছে আগামী প্রজন্ম। হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের তারুণ্য। ঘরবন্দী শৈশব। শিথিল হচ্ছে সামাজিক-পারিবারিক বন্ধন। একাকী জীবনের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে বসেছে অনেকেই।

সম্প্রতি মানব জীবনে ইন্টারনেট বা ভার্চুয়াল জগতের প্রভাব নিয়ে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদন আমাদের সামনে বেশ কিছু প্রশ্ন হাজির করেছে। ইঙ্গিত দিয়েছে আরো নিবিড় করে ভাবার। বিশেষ করে আজকের দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভার্চুয়াল জগতে কতটা নিরাপদ সে বিষয়টি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনগুলাতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে নতুন প্রজন্মকে এর অন্ধকার গলির আসছি থেকে নিরাপদ রাখতে এর ওপর অভিনির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার বিষয়।

টেলিকম এবং মিডিয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান অফকম এর নিবিড় জরিপ প্রতিবেদনে বলেছে, সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী ব্যবহারকারীরা তাদের ফেসবুক আইডির প্রায় ২৫ শতাংশ বন্ধুদের সাথে কখনই যোগাযোগ করে না। এ বয়সী ব্যবহারকারীরা সপ্তাহে প্রায় ১৭ ঘন্টা ইন্টারনেটে ব্যয় করে। আর বালিকারা সপ্তাহে ২২০টি টেক্সট সেন্ড করে থাকে।

শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের মিডিয়া ব্যবহার এবং আচরণ সম্পর্কিত ওই বার্ষিক প্রতিবেদন মতে, মাত্র ৪ বছর বয়সীরা টেলিভিশন এবং গেম খেলার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে। একইভাবে ৫ বছর থেকে ১৫ বছর বয়সীদের ৪০ শতাংশেরও বেশি লোকের ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ সাইটে প্রোফাইল রয়েছে। আর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের মধ্য এ হার ৮০ শতাংশ বেড়ে যায়। এছাড়া পরবর্তী বয়সীদের গড়ে ২৮৬ জন অনলাইন ফ্রেন্ড রয়েছে, যাদের ৯৩ শতাংশই অনলাইন নিরাপত্তার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলে দাবি করে।

অপরদিকে প্রায় ৮০ শতাংশ অভিভাবক তাদের শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন বলে দাবি করেন। কিন্তু তাদের অনেকেই নিজেদের কমপিউটারের যৌজখবর রাখেন না।

টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মাজির ও আন্দ্রিও এম লেডবেটার যৌথভাবে প্রকাশিত অপর একটি জরিপভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করেন না এবং বেশিরভাগ সময় যারা অনলাইনে কাটান তাদের হতাশা, একাকিত্বে ভোগার সম্ভাবনা বেশি। একপর্যায়ে বাস্তব জগত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এসব ব্যক্তি।

সম্প্রতি প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে কম্পালসিভ ইন্টারনেট ইউজ (সিআইইউ) বা বাধ্য হয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করা এবং অপরটি হচ্ছে এক্সসেসিভ ইন্টারনেট ইউজ (ইআইইউ) বা অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা।

টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মাজির ও আন্দ্রিও এম লেডবেটা পরিচালিত গবেষণা অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রবণতা থেকে সাধারণত মানুষ অনলাইনে আসেন। এরপর ধীরে ধীরে এখান থেকেই প্রথমে তৈরি হয় সিআইইউ এবং পরবর্তী সময়ে আসে ইআইইউ। এর পরই শুরু হয় মানসিক সমস্যা।

এ দুই গবেষক আরও জানান, অনলাইনে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার পর মানুষ এ নেটওয়ার্কে সারাক্ষণ লেগে থাকার জন্য বারবার অনলাইনে আসেন। যেসব মানুষের মুখোমুখি যোগাযোগের দক্ষতা খারাপ, তাদের অনলাইনে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ থেকেই আসে সিআইইউ।

সাউদার্ন কমিউনিকেশন জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণার ফল আগের গবেষণার ফল থেকে ভিন্ন। আগে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছিল, যেসব ব্যক্তি উদ্বিগ্ন থাকেন, তারা অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকি মনে করেন এবং অনলাইনে বেশি সময় কাটান।

এর বিপরীতে মাজেল ও লেডবেটারের গবেষণা অনুযায়ী, শুধু উদ্বিগ্নতায় ভোগা ব্যক্তিরাই অনলাইনে বেশি থাকেন না বরং তাড়নার বশবর্তী হয়ে অনলাইনে থাকা ব্যক্তিরাও উদ্বিগ্নতায় ভোগেন। এ গবেষণায় তাড়নার বশবর্তী হয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার এবং অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা অনলাইনকে যোগাযোগের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি মনে করেন। উদ্বিগ্নতার জন্য দায়ী সিআইইউ। ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে বাড়ে ইআইইউ। গবেষণা প্রতিবেদন মতে, হতাশা ও একাকিত্বের জন্য ইআইইউ নয় বরং দায়ী সিআইইউ, যেখানে মানুষ ইন্টারনেটে আসা থেকে নিজেকে সরিয়ে ▸

ভার্চুয়াল দুনিয়ায় প্রজন্মের নিরাপত্তা

ইমদাদুল হক

রাখতে পারেন না।

বছরজুড়ে এমন আরও অজনযানেক প্রতিবেদন বাস্তব জগত এবং ভার্চুয়াল জগতে নেটিজেন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের কোনো গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ না পেলেও পরিস্থিতি স্বস্তির পর্যায়ে নেই। তবে মুঠোফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিস্তৃতির পর থেকে দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রক্ষণশীল সমাজে চির ধরতে দেখা গেছে। অ্যালেক্সার মতো ইন্টারনেট ব্যবহার প্রবণতা বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত স্থানীয় পরিসংখ্যান বলছে, নিকট অতীতে সঙ্গোপনে পরিবার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন আর বরফ গলা শুরু হয়েছিল, তা আজ প্রকাশ্য রূপ নিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রের সাইবার নিরাপত্তা যেমনটা হুমকির মুখে, একইভাবে প্রোটেনশিয়ালিটি হারাচ্ছে আগামী প্রজন্ম। ইন্টারনেট ফাঁসে বুঁদ হয়ে দিগভ্রান্ত আগামী।

সম্প্রতি এর ভয়াবহ পরিণতি দেখেছি কক্সবাজারের রামুতে। প্রতিশ্রুতির শিথিলতা আর ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণহীন যাত্রায় ভস্মীভূত হয়েছে কক্সবাজারের রামু বৌদ্ধপল্লী। কিন্তু বরাবরের মতোই রাজনৈতিক রঙ চড়িয়ে আমরা লুকিয়ে যাচ্ছি নিজেদের প্রযুক্তি সচেতনতার সীমাবদ্ধতা। রামু ট্র্যাজেডির আগে মাত্র একটি নিন্দনীয় ভিডিও লিঙ্ক বন্ধ করতে গিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে ইউটিউব বন্ধ রেখে আমরা প্রমাণ দিয়েছি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা। অথচ হররোজ অনলাইনের অন্ধকার জগতে দেশের তরুণ সমাজের অভিসার আশঙ্কাজনক হারে বাড়লেও সে বিষয়ে এখনো কোনো যুথবদ্ধ উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয় বাস্তবায়নে গ্রাহকেরা অনুপাতভিত্তিক সাশ্রয়ে ব্যান্ডউইডথ সংযোগ মূল্য না পেলেও দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে। বেড়েছে এর বিস্তৃতিও। এই ইতিবাচক পরিব্যাপ্তি কতটা পুষ্ট ও নিরাপদে এগিয়ে যাচ্ছে, সময় এসেছে সেদিকে নজর দেয়ার। তাই দেশের ভার্চুয়াল আকাশে পুঞ্জিভূত কালো মেঘ, উল্কা ঝড় থেকে প্রজন্মকে নিরাপদে বেড়ে ওঠার দায়িত্ব এখন সবার। পথ সমূলে বন্ধ করে নয়, প্রযুক্তি দিয়েই ইন্টারনেটের ঐশ্বরিক অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার কৌশল বেছে নেয়া এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকেই সবার আগে এগিয়ে আসা দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল জি এম নিজাম উদ্দিন।

তিনি বলেন, ইন্টারনেট ব্যবহারে আমাদের দেশে সচেতনতার দারুণ অভাব রয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে এর অপব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বলতে গেলে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৭০ শতাংশ অনুৎপাদনশীল কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। আসলে দেশে প্রযুক্তিসংশ-ষ্ট ডিভাইস ব্যবহার এখন অনেকটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে নিজাম উদ্দিন বলেন,

জি এম নিজাম উদ্দিন

ইন্টারনেটে বিদ্যমান আপদ থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারিবারিকভাবেই বেশি সচেতন থাকতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বুঝিয়ে দিতে হবে বাস্তব জগত আর ভার্চুয়াল জগত এক নয়। এটা নেহায়েত কল্পনাজগত, যা বাস্তবে কখনই ধরা দেয় না। পাশাপাশি বাচ্চারা যেন ঘরবন্ধ করে একা একা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে না পারে সে দিকটাও নজর দেয়া দরকার। নেটিজেনদের অভিভাবকেরা এক্ষেত্রে কমপিউটারের ফায়ারওয়াল ব্যবহার করতে পারেন কিংবা সাইবারোম নেটজিনির মতো ইন্টারনেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

অনলাইনে বন্ধুত্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প-াটফর্ম ফেসবুক ব্যবহারে সবাইকেই আরো যত্নবান এবং সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, আমার মনে হয় আমাদের অনেকেই ফেসবুকে বৃথা সময় নষ্ট করেন। দীর্ঘক্ষণ সময় না কাটিয়ে দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে ফেসবুক ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে হালে এটি অনেকটা আসক্তি পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

তার ভাষায়, ভার্চুয়াল জগতের নানা ঘেরাটোপ সম্পর্কে সচেতন করতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সুধীজনদের দায়িত্বও কিন্তু কম নয়। তবে এ কাজে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারবেন আমাদের শিক্ষক ও প্রযুক্তি সচেতন সুশীল সমাজ। ভার্চুয়াল জগতের অনিয়ন্ত্রিত অভিসার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে মনে করেন এই শিক্ষক। তিনি বলেন, কাউন্সিলিংয়ে অপ্রাপ্ত বয়সী প্রজন্মের মূল্যবোধ চর্চার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি বা ফিল্টারিং কৌশল সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলে শুদ্ধ ইন্টারনেট চর্চায় দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

তার মতে, তখন আবারও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে আমাদের কোমলমতি শিশুরা। খিটখিটে মেজাজ, অমনোযোগিতা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া, চারিত্রিক স্খলন, রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার থেকে মুক্ত থাকতে পারবে উচ্ছল তারুণ্য।

আগামী প্রজন্মের জন্য ভার্চুয়াল জগত কতটা নিরাপদ প্রশ্নের জবাবে অ্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সৈয়দ আক্তার হোসেন বলেন, বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় পরিস্থিতি সুখকর নয়। বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, যেখানে বা যে পরিবেশে ইন্টারনেট সংযোগ সহজলভ্য সেখানের অবস্থা এখন অনেকটাই ওপেন সিক্রেট। সামগ্রিক অবস্থা বড়ই নাজুক।

আলাপকালে দেশের এমন পরিস্থিতির জন্য সরকারের সমন্বয়হীনতা, রূপকল্প প্রণয়নে বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ গুরুত্বারোপ না করা, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাজে লাগানোর বিষয়ে প্রয়াস না থাকা, পরিবারের সদস্যদের উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয়কে দায়ী করেন তিনি।

তিনি বলেন, ডিজিটাল ফ্যাসিস্ট থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে

অধ্যাপক সৈয়দ আক্তার হোসেন

বিষয়টি নিয়ে কাজ করা উচিত। ইন্টারন্যাশনাল গভর্ন্যান্স ফোরামের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে তৃণমূল পর্যায়ে গণসচেতনতামূলক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করা দরকার। একই সাথে সম্প্রতি ইউটিউব পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার মতো হাস্যকর সিদ্ধান্ত নেয়ার চেয়ে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে ফিল্টারিং বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার বলে মনে করেন আক্তার হোসেন।

দেশের ভার্চুয়াল আকাশকে পুষ্ট রাখতে অবিলম্বে সাইবার আইন প্রণয়নের দাবি করে তিনি বলেন, দেশের সাইবার আইন বিষয়ে একটি পরিষ্কার রূপরেখা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা না করে সাসটেইনেবল ল' প্রণয়ন করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনে বিদ্যমান আইন সংশোধন করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে অভিভাবকেরা কতটা নিশ্চিন্তে আছেন এমন প্রশ্ন রেখেছিলাম গ্রামীণফোনের পিঅ্যান্ডও আদিবা জেরিন চৌধুরীর কাছে। তিনি বলেন, ইন্টারনেট কিংবা মুঠোফোনের অনেক বিষয় সম্পর্কেই আমি আমার সন্তানের কাছে শিশু বলতে পারেন। ওরা এ বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ।

গুগল থেকে সার্চ করে নানা টিউটরিয়াল ঘেঁটে এরা যখন নিজেরাই নিজেদের অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে তখন আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যখন আমি তাদেরকে কাছে ডাকি তখনও ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকলে দারুণ রাগ হয়। তবে ওরা তো খুবই সেনসিটিভ, তাই ধৈর্য ধরেই এসব সামলাতে

(বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়)

ভার্চুয়াল দুনিয়ায়

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে। ওদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করি। ওদের মধ্যে সাধারণ মূল্যবোধগুলো গেঁথে দিতে চেষ্টা করি।

বাচ্চারা কতক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওরা তো সুযোগ পেলেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তবে আমি যতক্ষণ বাসায় থাকি ততক্ষণ প্রয়োজনের বাইরে ইন্টারনেট ব্যবহার যেনো না করতে পারে সেদিকটায় নজর দেই। বিশেষ করে রাতে কিংবা একা একা যেনো ইন্টারনেট ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য কমপিউটার লক করে রাখি। তবে সচেতনভাবে আমি কমপিউটার লক করে রাখার পক্ষে নই। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মূল্যবোধ, শুভবোধ না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুটা নির্দয় হতেই হচ্ছে।

কিন্তু ফিল্টারিং প্রযুক্তির মাধ্যমেই তো ইন্টারনেটের এমন বেহুমার কিংবা অনৈতিক ব্যবহার বন্ধ রাখা সম্ভব, সেটা করলেই তো পারেন পরামর্শ দেয়ার সাথে সাথে বিস্ময় প্রকাশ করে আদিবা জেরিন বলেন, তাই না কি, কিভাবে? এটা তো আমার জানা ছিল না। ইন্টারনেটে নিয়ে এত ক্যাম্পেইন দেখি, এমন বিষয় নিয়ে তো কখনও কথা বলতে শুনিনি। আসলে আদিবা জেরিনের মতো দেশের বেশিরভাগ অভিভাবকই প্রযুক্তি জগতে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত নন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভার্চুয়াল দুনিয়ার নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখতে বিষয়টি নিয়ে জাতীয়ভাবে কাজ করা দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষক মুশতাক ইবনে আইয়ুব। বর্তমানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত এই শিক্ষক অনলাইন সাক্ষাৎকারে বলেন, ক্ষেত্রবিশেষে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল বা ফিল্টারিং বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। তবে এটা যেনো বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না যায় সেদিকে নজর রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

মুশতাক ইবনে আইয়ুব বলেন, সন্তান যেনো বুঝতে না পারে তাদের অভিভাবকেরা তাদেরকে সন্দেহ করছে। আর বাবা-মা-ও সবসময় এমন নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ না করেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে ভার্চুয়াল জগতে নিরাপদ থাকতে আমাদের কী করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। আর এটা পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হলেই ভালো হয়। পাশাপাশি অনলাইনের অবাধ বিচরণে বিপথগামিতার যে দিকটি আপনি তুলে ধরছেন তা মোকাবেলার জন্য দুটি পর্যায়ে কাজ করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে ফায়ারওয়ালের মতো প্রযুক্তির ব্যবহার করে সন্তানদের ইন্টারনেট ব্রাউজের বিষয়টি সুনিয়ন্ত্রিত করা। তবে তারচেয়ে বেশি ভালো হয় বিনোদননির্ভর শিক্ষামূলক অ্যাপ বা সফটওয়্যার তৈরিতে মনোযোগী হলে। আর এ মুহূর্তে অভিভাবকরা যদি প্যারেন্টাল কন্ট্রোল বা ফিল্টারিং করেন তাহলে এই সংক্রমণ কিছুটা হলেও কমবে। তখন অন্ধকার জগত থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা সহজ হবে। আর এজন্য পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশেষ করে স্কুলগুলোতে নেট ফিল্টারিং ডিভাইস ব্যবহারের পাশাপাশি অভিভাবক পর্যায়ে সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অবশ্য ভার্চুয়াল দুনিয়া পরিভ্রমণে শুধু ছোটরা নয় বড়রাও আজ কমবেশি ইন্টারনেট নামের এই সম্মোহনী জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন, এমন আভাসই দিলেন মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোস্তাফা আল মামুন। তিনি বলেন, অল্পদিনেই এটি একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের আগে থেকেই এ বিষয়ে ভাবতে হবে। ইন্টারনেটের অপব্যবহার সীমিত রাখতে সবাইকেই একযোগে কাজ করতে হবে।